সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডা জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়

বাঙ্গালীদের পাশাপাশি বাংলাদেশে আরও আছে ৪৫টির মত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, যাদের রয়েছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন এ সকল সংস্কৃতি। এ ৪৫টি বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য, প্রথা ও অভ্যাসের অধিকারী।

এ সকল বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে আরও বলা হয় 'আদিবাসী', যাদেরকে বাঙ্গালীরা অবজ্ঞার চোখে দেখে, আজও তারা এদের যে নামে ডাকে হচ্ছে 'বুনো মানুষ', যার অর্থ 'বনের মানুষ'... যেহেতু এদের অধিকাংশের জীবন বনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে 'বুনো মানুষ' কথাটি আরও একটি অর্থ বহন করে, এর দ্বারা বোঝানো হয় 'বন্য ও অসভ্য'...

বইপত্র ও খবরের কাগজে এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সাধারণত: 'উপজাতি' বলে উল্লেখ করা হয়, এটি একটি বাংলা শব্দ যার ইংরেজী করলে হবে 'inferior race', অর্থাৎ 'নিকৃষ্ট বা হীন জাতি'...।

'বুনো মানুষ' ও 'উপজাতি' উভয় শব্দ দু'টি ঘৃণ্য নাম, আর আদিবাসী সম্প্রদায় এগুলোর ব্যবহারে জোর বিরোধিতা করেছে ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এই প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে আজকে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে এক নতুন নামে অভিহিত করা হয় আর তা হল 'আদিবাসী'।

শব্দটির ইংরেজী হচ্ছে 'indigenous' বা 'early inhabitant' অর্থাৎ 'আদিম' বা 'আদি বাসিন্দা'...

এই নতুন নামের মধ্য দিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়কে দেশের প্রথম বা আদি বাসিন্দা বলে স্বীকার করা হয়।

অর্থাৎ এ সকল সম্প্রদায় এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে অন্যান্য জাতির (যেমন বাংলাদেশের বাঙ্গালি জাতি) এ দেশে আগমনের বহু আগে থেকেই।

এই একই নাম বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর বেলায়ও ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার প্রণীত মানচিত্রে এ ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দেশের ৪ ভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান :

১। উত্তর-পূর্ব অঞ্চল : দিনাজপুর ও রাজশাহী
২। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল : সিলেট
৩। মধ্য অঞ্চল : ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল-ঢাকা
৪। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল : পার্বত্য চট্টগ্রাম-বান্দরবন

দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বিখ্যাত সুন্দরবন। 'বন' একটি বাংলা শব্দ যার ইংরেজী হচ্ছে 'forest' আর 'সুন্দরী' হচ্ছে একটি অমূল্য গাছ/কাঠ যা এই বনে জন্মায়। সুতরাং, 'সুন্দরবন' অর্থ হল 'সুন্দরী গাছের বন'। এই বন হচ্ছে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অভয়ারণ্য।

তবে হরিণ, কুমির, সাপ ইত্যাদি অন্যান্য বন্য পশুদের জন্যও সুন্দরবন আদর্শ আবাসভূমি।

বাংলাদেশের খুব কম লোকেরই জানা আছে যে, এই বনের উপকূলে একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের পূর্বপুরুষগণ এ অঞ্চলে প্রথম বসতি গেড়েছিলেন : এখানে এসে চাষ-আবাদের জন্য তাদেরকে গাছপালা কাটতে হয়েছিল। এদের মধ্যে এখনো এমন কয়েকজন প্রবীণ আছেন যারা কিভাবে বনের বাঘ, কুমির ও সাপের সঙ্গে তাদের লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে তা শোনাতে পারেন ... ! আর এ সকল আদিবাসীরা হচ্ছে, সুন্দরবন অঞ্চলের মুণ্ডারা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মরত জেভেরিয়ান মিশনারীগণ মাত্র কয়েক বছর আগে এদের কথা জানতে পারেন। এখানে কয়েকটি পৃষ্ঠায় এই

বাংলাদেশে আদিবাসীদের অবস্থান

বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে আমরা আদিবাসীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি। বাংলাদেশের আদিবাসীদের অবস্থানকে প্রধানত চারটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন (১) চট্টগ্রাম অঞ্চল, (২) সিলেট অঞ্চল, (৩) ময়মনসিংহ অঞ্চল, এবং (৪) উত্তরবঙ্গ অঞ্চল। এই চরটি অঞ্চলে বসবাস করে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়। নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে আলোচনা করা হল :

(১) চট্টগ্রাম অঞ্চল :
বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার তিনটি জেলা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলে চাকমা, বোম, লুসাই, খুকি, মুরং, ত্রিপুরা, তংচঙ্গা, মগ বা মারমা, রাখাইন, বড়ুয়া, খাকক, নৈনাক, পাংখো, বনযোগী প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে।

(২) সিলেট অঞ্চল :
বৃহত্তর সিলেট জেল্যার সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার জেলা নিয়ে এ অঞ্চল। এখানে মণিপুরী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, হাজং, উঁরাও এবং গারো আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করে।

(৩) ময়মনসিংহ অঞ্চল :
ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও জামালপুর জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হল : গারো, হাজং, হদি, ডালু, বানাই, কোচ, বর্মন, মান্দাই প্রভৃতি।

(৪) উত্তরবঙ্গ অঞ্চল
বৃহত্তর দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর এবং রাজশাহী জেলা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো হল সাঁওতাল, উরাঁও, মাহালী, পাহাড়িয়া, মাহাত্য, মুণ্ডা, রাজবংশী, হোমালো প্রভৃতি।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনগণ।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যাদেরকে বৃহত্তর সমাজ ও বাংলাদেশ সরকার দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের সম্পর্কে কিছু বলা হবে।

সুন্দরবনের আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়

যতদূর জানা যায়, সুন্দরবনের উপকূলে বসবাসরত আদিবাসী মুণ্ডাদের উপর কোন লিখিত দলিল নেই। তাদের সম্পর্কে একমাত্র ‘সাহিত্যকর্ম’টিতে আছে সাম্প্রতিকালে কয়েকটি খবরের কাগজে প্রকাশিত কিছু রচনা। এ রচনাগুলো বাংলা ও ইংরজী উভয় ভাষায় প্রকাশিত। এ কয়েকটি রচনা ছাড়াও, খুলনার ‘উপকূলীয় উন্নয়ন অংশীদারিত্ব’ নামের এক ক্ষুদ্র এনজিও পরিচালক কর্তৃক সম্পাদিত ‘আদিবাসী বার্তা’ শীর্ষক একটি পত্রিকা এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য যোগায়। এই একই সম্প্রদায় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য ঠাঁই পেয়েছে একটি ক্ষুদ্র তবে খুবই আকর্ষণীয় বুকলেটে আর এটি লিখেছেন মিলন কুমার দাস, যিনি হচ্ছেন অস্পৃশ্য মুচি-ঋষি সম্প্রদায়ের এক তরুণ যুবক। সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের সম্পর্কে লিখিত রচনাবলী বলতে যা পাওয়া যায় তা এ-ই সব ! আর তাদের ইতিহাস ?

এ সম্প্রদায়ের প্রবীণদের মত অনুসারে, তাদের পূর্বপুরুষগণ বিহারের রাজধানী রাঁচি থেকে এখানে এসেছিলেন। বিহার ভারতের ২৮টি প্রদেশের মধ্যে একটি। তারা ঠিক কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন তা সুনির্দিষ্ট করে বললে, বলা যায়, বিহারের দক্ষিণাঞ্চল থেকে, যা ‘ছোটনাগপুর’ নামে পরিচিত আর ভারতের ৪টি প্রদেশের মাঝখানে এর অবস্থান, যেমন : বিহার-উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ-মধ্যপ্রদেশ। ছোটনাগপুরে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষ মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর। এ থেকে বুঝা যায়, সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডারা ভারতের কোন্ দিক থেকে এসেছিল।

পূর্ববঙ্গে এদের আগমন কবে ঘটেছিল ?

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এরা কখন বসতি স্থাপন করে ?

তাদের আদি বাসভূমি থেকে কারা তাদের এখানে এনেছিল ?

ঐতিহাসিক কোন নথি না পাওয়ায়, এ সকল প্রশ্নের উত্তরদানের একমাত্র সম্ভাব্য উপায়টি হচ্ছে সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের শ্রুতি-পরম্পরার উপর নির্ভর করা। এ শ্রুতি-পরম্পরা অনুসারে, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জমিদার প্রথা চালু হলে এবং জমিদাররা সুন্দরবন বনাঞ্চলের প্রচুর জমিজায়গার ইজারা নিলে, আদিবাসী মুণ্ডাদের এখানে আনা হয় বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার ক'রে সেই জায়গায় চাষাবাদ করার জন্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' নামক তাঁর গ্রন্থে ড: নিহার রঞ্জন সরকার উল্লেখ করেছেন : 'সুন্দরবনের নিম্নবর্ণের জেলেদের মধ্যে, নিম্ন বঙ্গীয় কিছু কিছু স্থানে, বিশেষ করে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে, মাঝে-মধ্যে হঠাৎ করে দেখা মেলে খর্বাকৃতি মানুষদের, যাদের গায়ের রং কৃষ্ণ কালো, ঝাঁকড়া চুল, মোটা ঠোঁট ও থেবড়া নাক। তাদের দেখে মনে হয়ে তারা নিগ্রো বংশোদ্ভূত।'

একশ' বছরেরও বেশী আগে লিখিত এই বইয়ে উল্লিখিত জনগোষ্ঠীটি খুব সম্ভবত মুণ্ডা সম্প্রদায়।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, এ সকল মুণ্ডারা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতিগোষ্ঠীর।

তাদের শনাক্ত করা আদৌ কঠিন কিছু নয় : তাদের সমস্ত কিছুই প্রকাশ করে যে, তারা বাঙ্গালী জাতিভুক্ত নয়, যে জাতি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন...!

শ্রুতি-পরম্পরা অনুসারে আরও বলা যায়, বিট্রিশরাজদের শাসনকাল অবধি সুন্দরবনের আদিবাসী মুণ্ডারা, যে সমস্ত জায়গা তারা বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেছিল, সে সকল জায়গার ভাল ভাল জমির অধিকারী ছিল আর তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল।

কিন্তু ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার কিছু কালের মধ্যেই, তাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালীরা, হোক হিন্দু বা মুসলমান, তাদের জমি-জায়গা বেদখল করে নেয়।

আজকে দরিদ্র আদিবাসী মুণ্ডারা পুরোপুরি ভূমিহীন !

মনে করা হয় যে, ব্রিটিশ আমলে দেশের ঐ অঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডা জনসংখ্যা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক।

কিন্তু, বাঙ্গালীরা তাদের জমিজায়গা বেদখল করে নেওয়ার সাথে সাথে তাদের জনসংখ্যাও কমতে শুরু করে।

তাদের মধ্যে বড় একটা অংশ সীমানা অতিক্রম ক'রে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তবে যারা ওপারে চলে গিয়েছে এবং যারা এপারে রয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এখনো সুসম্পর্ক বিদ্যমান।

সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের মোট জনসংখ্যা এবং তাদের অবস্থান

এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা সঠিক কত তা নির্ণয়ে জেভেরিয়ান মিশনারীগণ পরিচালিত লোকগণনা অনুসারে, সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের সংখ্যা ৩২০০ জন।

আর তাদের অবস্থানের ব্যাপারে বলা যায়, এ সকল আদিবাসী মুণ্ডাদের সবচেয়ে বেশী দেখা মেলে শ্যামনগর থানায়।

এ থানার অন্তর্গত প্রায় ১৬০০ জন মুণ্ডার বসবাস।

অপরদিকে, ১২০০ মুণ্ডার কয়রা থানার অন্তর্গত বসবাস।

আর শুধুমাত্র ৪০০ মুণ্ডার তালা থানার অন্তর্গত।

কয়রা ও শ্যামনগর উভয় থানা সুন্দরবন বনাঞ্চলের খুব কাছেই অবস্থিত। তবে তালা থানার অবস্থান এ বনাঞ্চল থেকে বেশ দূরে।

তালা থানার অন্তর্গত মুণ্ডাদের ৪০ বছর আগে কয়রা ও শ্যামনগর থেকে এখানে 'আমদানী' করেছিল কিছু বিত্তশালী মুসলমান, নিজেদের জমিজমা চাষের জন্য।

সেই সময় এ সকল মুসলমান ঐ সকল মুণ্ডা শ্রমিকদের কথা দিয়েছিল যে, তারা যে জায়গায় তাদের ছাউনি তুলেছে অন্ততপক্ষে সেই জায়গাটুকুর তারা মালিক হবে ...কিন্তু এ পর্যন্ত তালায় বসবাসরত আদিবাসী মুণ্ডারা শুধুমাত্র নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নেওয়া বাতাসের অধিকারী ... এ সকল আদিবাসী মুণ্ডাদের এখানে-ওখানে

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট গ্রামে বসবাস, যেগুলোর অধিকাংশ অস্বাস্থ্যকর স্থানে আর কোন রাস্তা নেই। বর্ষাকালে এ সকল গ্রাম তাদের কুটিরের চারপাশে ঘিরে থাকা জল ও কাদায় ডুবে যায়।

এ ধরনের বৈরী পরিবেশে এ সকল মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে, তা চিন্তা করে একজন বিস্ময় প্রকাশ করতেই পারে !

সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

যে সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয় নৃবিজ্ঞানীগণ সেগুলো নির্দেশের এ মানদণ্ডগুলো দাঁড় করিয়েছেন :

– ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্নতা
– স্বতন্ত্র সংস্কৃতি
– আদিম বৈশিষ্ট্য
– বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে মেলামেশায় লজ্জা
– অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা
– গান-নাচ-মদ পছন্দ।

এ সকল বৈশিষ্ট্যের সবগুলো সুন্দরবন উপকূলীয় মুণ্ডাদের মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর গ্রামগুলো অন্যান্য জনগোষ্ঠীর গ্রামগুলো থেকে একেবারে আলাদা। তাদের গ্রামগুলো অনেক দূরে দূরে, বিচ্ছিন্ন আর অস্বাস্থ্যকর স্থানে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশী প্রধান স্রোতধারার সঙ্গে তারা মিশে যেতে বাধ্য হলেও, তাদের রয়েছে কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেগুলো তাদের এ দৃঢ় প্রত্যয় যোগায় যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়ের মানুষ যারা একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও পরিচয়ের অধিকারী।

তাদের জীবন-পদ্ধতি এবং বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাস খুবই আদিম বলে মনে হয় : তাদের অর্থনীতি হচ্ছে দিন এনে দিন খাওয়ার অর্থনীতি আর তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো খুব কমই পূরণ হয়...।

গান, নাচ ও মদপান তাদের জীবন ও সংস্কৃতির একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বলা হয়ে থাকে যে, মুণ্ডা শিশুরা কথা বলার অনেক আগেই গান করতে এবং হাঁটতে শেখার অনেক আগেই নাচ করতে শেখে...।

ধর্মীয় পালা-পার্বণ, বিবাহ ও অন্যান্য আনন্দঘন ঘটনাবলীর ন্যায় বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য বাড়িতে তৈরী ভাত থেকে প্রস্তুত মদ চা-ই চাই।

সংক্ষেপে, এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত এ সকল মুণ্ডারা হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, যারা বাঙ্গালীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর যারা নিজেদের 'আদিবাসী' অভিহিত করতে পারার দরুণ গর্বিত।

সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের দুঃখ-দুর্দশা

একেবারে ভূমিহীনতা

সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের উপর তার বুকলেটে, মিলন দাস একজন ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি হচ্ছেন অখিল মুণ্ডা, শ্যামনগর থানার অর্ন্তগত গাবুরা গ্রামের একজন ভদ্রলোক।

এ মুণ্ডা ভদ্রলোক কুড়ি বছর আগে ৩০ একর জমির মালিক ছিলেন... আর আজকে এমনকি যে এক চিলতে জমির উপর তার কুটির দাঁড়িয়ে আছে, সে জমিটুকুও তার নয়...।

'আমার মৃত্যুর আগে একমাত্র যে জিনিসটি আমি দেখে যেতে চাই – বলছেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অখিল মুণ্ডা – আমার পায়ের নীচে এক খণ্ড জমি, যেন আমার ঘর সরিয়ে নেওয়ার বা ভেঙ্গে ফেলার ভয়ের মধ্যে আমাকে আর থাকতে না হয়।'

এ ভদ্রলোকের মত উপরে যে তিনটি থানার কথা বলা হল, সেগুলির অন্তর্গত মুণ্ডাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ ভূমিহীন। আবাদি জমি দূরে থাক, এমনকি যে এক খণ্ড জমির উপর তাদের কুটির দাঁড়িয়ে তা-ও তাদের নয় !

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, আজকে তাদের প্রতিবেশী ধনী বাঙ্গালী মুসলমান-হিন্দুরা যে জমি-জায়গার অধিকারী, তা একদা এ সকল মুণ্ডারা নিজেরা ও তাদের পূর্বপুরুষরা চাষযোগ্য করে তুলেছিলেন।

আরও ভয়ানক হল, ৩০টি মুণ্ডা গ্রামের অর্ধেকের বেশী গ্রাম সম্পূর্ণ লবণাক্ত জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ সকল স্থানে এমনকি ঝোপঝাড়ও জন্মায় না, এ ধরনের অত্যন্ত বৈরী স্থানে বসবাসকারী মানুষজন গৃহপালিত পশু-পাখিও পালন করতে পারে না, কেননা এ ধরনের লবণাক্ত পরিবেশে এগুলো বাঁচে না।

স্বাস্থ্য এবং মলনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বলতে গেলে সম্পূর্ণ লবণাক্ত জায়গায় অবস্থিত সকল মুণ্ডা গ্রামগুলোর অন্যতম সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, পানীয় জলের সমস্যা।

বাস্তবিকপক্ষে কোথাও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় দূরের কথা, এগুলো সম্পর্কে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীকে কখনো অবহিত করা হয়নি বলেই মনে হয়।

এমনটি পরিলক্ষিত হয় যে, মুণ্ডাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তারা খুব লজ্জিত কিংবা খুব ভীত অথবা তারা এত দরিদ্র যে, স্থানীয় ডাক্তারের কাছে কিংবা আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার তাদের সামর্থ নেই। এটাই সম্ভবত সন্তান জন্মদানের সময় মুণ্ডা মায়েদের মধ্যে উচ্চ মৃত্যুহারের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ।

বাসস্থান

গ্রামীণ বাংলাদেশে, আজকাল খুব কম দরিদ্র লোকই বিচুলির ছাউনি ঘরে বাস করে।

বিচুলির ছাউনি বা চাল বানানোর জন্য শুধু প্রয়োজন হয় মজুরীর। তবে এ ধরনের চাল বড়জোর একটি বর্ষাকাল পার হয়, তাছাড়া এ ধরনের চাল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা এটা ছোট ছোট সাপ, আরশোলা এবং আরও অনেক রকমের পোকামাকড়ের আরামদায়ক বাসা হিসেবে কাজ করে।

বিচুলির তৈরী একমাত্র এই চালই অধিকাংশ মুণ্ডা তাদের ঘরের জন্য সংস্থান করতে পারে।

শিক্ষা

সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডারা বলতে গেলে একেবারে অশিক্ষিত ! কয়েক মাস আগে পরিচালিত লোকগণনা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, ৩২০০ জন মুণ্ডার মধ্যে মাত্র ৩০-৪০ জনের সাক্ষরতা ও সংখ্যাপাঠ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে।

মাত্র দু'জন মুণ্ডা তরুণ কলেজ ছাত্র আর এদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন হাই-স্কুলে পড়াশোনা করছে।

এই সার্বিক পশ্চাদপদতার পেছনে অন্যতম কারণ হল, মুণ্ডাদের রয়েছে একটি নিজস্ব ভাষা, 'নাগ্‌রি'। এ ভাষা বাংলা, হিন্দি ও উর্দুর মিশ্রণ বলে মনে হয়।

অধিকাংশ বয়স্ক মুণ্ডা বাংলায় কথা বলতে পারলেও তাদের বাংলা উচ্চারণ স্পষ্ট নয় আর বাংলা ব্যাকারণ পুরোপুরি ভুলে বসে আছেন। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'নাগ্‌রি' ভাষায় কথা বলেন। ফলশ্রুতিতে, মুণ্ডা ছেলেমেয়েরা না পারে বাংলায় কথা বলতে, না পারে এ ভাষা বুঝতে।

নারী শিক্ষা বলতে গেলে অনুপস্থিত।

স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে একমাত্র যে মেয়েটি হাই স্কুল পর্যন্ত গড়াতে পেরেছে, সে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে।

সুন্দরবন বনাঞ্চলের মুণ্ডাদের মধ্যে কারোরই কোন বিশেষ পেশায়, যেমন দর্জি, যন্ত্র, কাঠ বা বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে, কারিগরী শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়নি।

তাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এ বছর কারিতাস বাংলাদেশ এবং কইনোনিয়া (দু'টি বাংলাদেশী এনজিও) কয়েকজন মুণ্ডা ছেলেমেয়েকে কিছু কারিগরী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করছে।

সামাজিক বৈষম্য

তারা নিজস্ব একটি সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ায় আদিবাসী মুণ্ডাদের রয়েছে আহার ও পানের অভ্যাস। এ সকল অভ্যাস বাঙ্গালীদের নিকট ঘৃণার আর তাই এগুলোই হচ্ছে, সামাজিক বৈষম্যের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ, যে সামাজিক বৈষম্য তাদের প্রতি আজও চলছে।

ইঁদুর মুণ্ডাদের একটি উপাদেয় খাদ্য আর বাড়িতে ভাত থেকে তৈরী মদ পর্যাপ্ত পরিমাণ পান ব্যতীত কোন সামাজিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় না : এ মদ মুসলিম ও হিন্দু উভয় ধর্মে নিষিদ্ধ !

এ জন্য বাঙ্গালীরা মুণ্ডাদের কম-বেশী জাতিচ্যুত ও অস্পৃশ্য হিসেবে দেখে আর তাদের সঙ্গে পানাহার একেবারে নিষিদ্ধ, আন্ত:বিবাহ তো দূরের কথা !

এখন প্রশ্ন জাগে, সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সমাজ কি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ? এ ধরনের বৈরী পরিবেশে

বসবাসরত এ সকল দরিদ্র আদিবাসী মুণ্ডারা যদি হারিয়ে না যায়, তাহলে একজন বিস্ময় প্রকাশ করতেই পারে...!

জেভেরিয়ান মিশনারীগণ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে চায়, তবে তারা যেন শুধুমাত্র বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য নয়, কিন্তু এদেশের স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল এবং সম্মানিত নাগরিক হিসেবে বৃহত্তর বাংলাদেশী সমাজে তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়েও তারা যেন বসাবস করতে পারে।

সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের মানব উন্নয়নে একটি ১৫ বছর ব্যাপী পরিকল্পনা

নিম্নোক্ত খাতগুলোর মধ্য দিয়ে জেভেরিয়ান মিশনারীগণ আদিবাসীদের তাদের ভাগ্যের উন্নয়নে সহযোগিতা করতে চায় :

১। শিক্ষা

বৃহত্তর বাংলাদেশী সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়ার লক্ষ্যে অপরিহার্য হল, যেন মুণ্ডা ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়।

তাই ছেলেমেয়েদের সাক্ষরতা ক্লাস নেওয়ার জন্য প্রতিটি মুণ্ডা গ্রামে একটি করে ছোট স্কুল গড়ে তোলা হবে, যেন এ সকল ছেলেমেয়ে বাংলা লেখার ও জীবন কৌশলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

যে কয়েকজন মুণ্ডা সন্তোষজনক উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে এ সকল ছোট ছোট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে বেছে নেওয়া হবে।

কন্যা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে।

যখন অনেক বেশী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতিসাধন করবে, তখন বড়রা যেন নিপীড়িত ও প্রতারিত হওয়া ছাড়াই শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে যোগ দিতে পারে, সে লক্ষ্যে তাদের গড়ে তোলার জন্য, তাদের কারিগরী প্রশিক্ষণ বা এক ধরনের দক্ষতা প্রদান করা প্রয়োজন হবে।

২। স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্যবিধান

যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক, তাই নিজেদের যত্ন কিভাবে নিজেদের নিতে হয় সে বিষয়ে মুণ্ডা গ্রামগুলির বয়স্ক ও নাবালক উভয়কে প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যে পয়:নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যসেবাকে ঘিরে নানা কার্যক্রম শুরু করা দরকার।

মুণ্ডা সমাজের যেহেতু অজ্ঞতার মধ্যে বসবাস, তাই একেবারে এ সকল মৌলিক স্তর থেকে শুরু করা, যেমন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশুর জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্তী পরিচর্যা ইত্যাদি।

একই সময়ে যেন প্রতিটি মুণ্ডা গ্রাম পানীয় জলের সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন

এ যাবৎ অধিকাংশ মুণ্ডা অর্থনীতি সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান বা কোন জ্ঞন না নিয়ে শ্রমিক হিসেবে শ্রম দিয়ে এসেছে। তারা শোষিত হয়েছে মালিক কর্তৃক, প্রতারিত হয়েছে সমাজের সদস্য কর্তৃক, তারা তাদের জমি-জায়গা হারিয়ে আজকে এনজিওগুলো থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিচ্ছে।

কাজেই জীবিকার বিকল্প নানা উপায় ও মাধ্যম খুঁজে পেতে মুণ্ডাদের সাহায্য করা দরকার, যেন তারা একদিন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে !

এক্ষেত্রে স্বয়ং মুণ্ডাদের দ্বারা পরিচালিত একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে।

যেহেতু মুণ্ডারা গভীর সামাজিক বন্ধনের অধিকারী এবং তাদের মধ্যে নৈতিকবোধ প্রকট, তাই এ ধরনের ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট ইউনিয়ন অথবা অন্য কোনকিছু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ ও সাহায্য করতে পারে।

৪। মানবাধিকার

মুণ্ডাদের এটা বুঝতে সাহায্য করা দরকার যে, এ দেশে তাদেরও অধিকার আছে।

প্রথমত তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া দরকার... বিভিন্ন বইপত্র, মানচিত্র ও পরিসংখ্যানে উল্লেখ থাকা দরকার যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও একটি আদিবাসী সমাজের বসবাস।

এরপর তাদেরকে অবশ্যই এ দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া দরকার। 'বুনো' ইত্যাদির ন্যায় অমর্যাদাকর নামগুলোকে তাদের মানব মর্যাদার প্রতি অত্যন্ত অপমানকর বলে বিবেচনা করা উচিত।

অধিকন্তু, তাদের সাহায্য করা দরকার যেন তারা অন্তত পক্ষে যে জায়গাটুকুর উপর তাদের কুটির দাঁড়িয়ে আছে সেই জমির বৈধ মালিক হতে পারে।

৫। সাংস্কৃতিক পরিচয়/ঐতিহ্য সংরক্ষণ

মুণ্ডারা তাদের মুণ্ডা পরিচয়ের সঙ্গে খুবই বলিষ্ঠ বন্ধন অনুভব করে। উন্নয়নের জন্য পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় এই পরিচয়কে মুছে ফেলা যাবে না। তাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখতে মুণ্ডাদের সাহায্য করার জন্য গান, নাচ, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

৬। বাংলাদেশ / ভারতে অন্যান্য মুণ্ডাদের সঙ্গে যোগবন্ধন

অনেক মুণ্ডা গ্রাম তাদের পূর্বপুরুষদের স্বদেশভূমি থেকে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসী মুণ্ডা সমাজ (যশোর ও দিনাজপুর জেলা) থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।

বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন মুণ্ডা সমাজের মধ্যে যোগবন্ধন সামগ্রিকভাবে মুণ্ড সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি, ঐক্য ও শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৭। সরকার ও বৃহত্তর সমাজের অংশগ্রহণ

মুণ্ডা পরিস্থিতির উন্নয়ন দ্বিমুখী : পরিবর্তন আসতে হবে মুণ্ডা সমাজের ভিতর থেকে এবং পরিবর্তন আসতে হবে মুণ্ডা সমাজের বাইরে থেকে।

তাদের গ্রামগুলিতে তারা কি কি পরিবর্তন আনতে চায় এবং তাদের জীবন মান উন্নয়নে কি কি কর্মকৌশল অবলম্বন করা যায়, তা মুণ্ডাদের নিজেদেরই স্থির করতে হবে।

তবে একই সময়ে, সরকার ও বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে প্রথমে সুন্দরবন বনাঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডাদের দুরবস্থাময় পরিস্থিতির জন্য কিছু দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে...।

এরপর সরকার ও বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, যদি কেউ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথমে ধন্যবাদ পাওয়া উচিত আদিবাসী মুণ্ডাদের, যারা বনের বাঘ ও জলের কুমিরের সঙ্গে লড়াই করেছে।

সবশেষে সরকার ও বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে বুঝতে হবে যে, সময় এসেছে সামনে এগিয়ে আসার এবং তাদের পরিস্থিতির উন্নয়নে মুণ্ডাদেরকে সাহায্য করার ।

কৃতজ্ঞতা : ফাদার লুইজি পাজ্জি, এসএক্স

ঋষি সম্প্রদায় এবং কাথলিক মণ্ডলী [১]
একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের ঋষি সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি। বাস্তবিকপক্ষে, আমি গর্বিত যে, আমার ঘনিষ্ঠ বাংলাদেশী বন্ধুদের অধিকাংশ ঋষি, আর আমি সগর্বে কাজটা করি। আমার বিশ্বাস ঋষিরা, যারা বাংলাদেশে অমর্যাদাকর মুচি নামে পরিচিত, তারা এমন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ যারা যুগ যুগব্যাপী নিপীড়ন ও দাসত্ব সত্ত্বেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সংখ্যালঘুর মধ্যে একটি সংখ্যালঘু হিসেবে, ঋষি জনগোষ্ঠী আজকের বাংলাদেশে প্রান্তিকশ্রেণীর সম্প্রদায়। মরা গরু ও গরুর চামড়ার তাদের ঐতিহ্যবাহী কারবারের দরুণ একটি অস্পৃশ্য দল হিসেবে চিহ্নিত, ঋষি সম্প্রদায় পঞ্চম জাতভুক্ত, মানব ধর্ম শাস্ত্র[২] অনুসারে যার কোন অস্তিত্ব নেই। বাস্তবিকপক্ষে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার ও সমাজচ্যুত করা হয়েছে। ঐশী ব্যবস্থা হিসেবে বিচারিত ও বিবেচিত জাতপ্রথার কপটতার অন্তরালে তাদের মানব পরিচয়কে পাকাপোক্তভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। চণ্ডাল হচ্ছে কথিত অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর একটি সমষ্টিগত নাম আর চণ্ডাল সম্পর্কে মানব ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয়েছে :

> 'চণ্ডাল ও শ্বপচদের আশ্রয় গ্রামের বাইরে। তাদের অপপাত্র করবে (অর্থাৎ জলপাত্রাদি দিবে না), এদের ধন কুকুর ও গাধা।
>
> এদের পরিধেয় হল শববস্ত্র, ভোজন ভগ্নপাত্রে, অলংকার লোহার তৈরী ও সর্বদা ঘুরে বেড়ান (এদের কাজ)।
>
> ধর্মানুষ্ঠানকারী লোক তাদের সঙ্গে (দর্শনাদি) ব্যবহার করবেন না। তাদের ঋণাদানাদি ব্যবহার পরস্পর (নিজেদের মধ্যে) হবে (এবং) বিবাহ হবে স্বজাতীয়দের সঙ্গে।
>
> এদের অন্ন পরিধান (অর্থাৎ সজ্জন সরাসরিভাবে এদের অন্ন দিবেন না, ভৃত্যের মাধ্যমে দিবেন), ভগ্নপাত্রে (অন্ন) দেয়; তারা রাত্রিবেলা গ্রামে ও শহরে বিচরণ করবে না।
>
> (এরা) দিনে কাজের জন্য রাজার অনুমতিতে কোন চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে বিচরণ করবে এবং অনাথ শব গ্রাম থেকে বাইরে বহন করে নিবে – এই নিয়ম।'[৩]

মানব ধর্ম শাস্ত্রের এ কথাগুলি পাঠ ক'রে ঋষি, কাওরা, ডোম, মেথর প্রভৃতিরা যেন লজ্জাবোধ না করেন। কেননা আমরা হলাম এমন মানুষ, যাদের লজ্জা থাকা উচিত নয় ! যাই হোক, মোটামুটি বিগত দু'টি শতকে, ঋষি সম্প্রদায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, প্রধানত খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে আসারই কারণে। আর এটাই হচ্ছে এখানে এই আলোচনার মুখ্য বিষয়। তবে সংস্পর্শে আসার এ ধরনের জটিল বিষয়সমূহে প্রবেশ করার আগে, আমি বলতে চাই যে, এখানে আমি যা বলব তা প্রধানত কাথলিক মণ্ডলীর উপস্থাপিত বিশিষ্ট খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে আজকে খুলনা বিভাগের ঋষি সম্প্রদায়ের সম্পর্ককে ঘিরে। বিভিন্ন নাম বা পরিচয়ের অধিকারী ঋষি[৪] সম্প্রদায়ের লোকদের বাংলাদেশের সর্বত্রই দেখা মেলে, এমনকি যদিও এদের সবচেয়ে বেশী দেখা মেলে খুলনা ও যশোর জেলায়। এই আলোচনায় চেষ্টা করা হবে, সংক্ষেপে, এ ধরনের একটি সম্পর্কের অতীত ও বর্তমান চিত্র তুলে ধরার বা ব্যাখ্যা করার। এরূপ একটি সম্পর্কের কথা, যা আমি একটি রূপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করব, Cosimo Zene তার 'বাংলাদেশের ঋষি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যখন ঋষি সম্প্রদায়ের একজনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার নিকট খ্রীষ্টধর্ম কি, তখন এ ব্যক্তি উত্তর দিয়েছিল : "আমরা হলাম সাপের মত যার মুখের মধ্যে একটি ব্যাঙ, ব্যাঙটা এত বড় যে না পারা যায় গেলা, আবার এত লোভনীয় যে না পারা যায় ছেড়েও দেওয়া।"[৫] এই রূপকটি একেবারে প্রথম থেকেই ঋষি সম্প্রদায় ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে জটিল সম্পর্ক সম্পর্কে আমাদের ধারণা যোগায়। আমরা এ বিষয়টিতে কোন এক সময় ফিরে আসব।

বাংলায় পর্তুগীজদের দ্বারা পরিচালিত বাণীপ্রচার কার্যের প্রথম দফায় (১৫১৭-১৮৩৪ খ্রী:), ঢাকা, চট্টগ্রাম

ও উপকূলীয় অঞ্চলের ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষদের সংগঠিত করা হয়েছিল কি-না তা জানা নেই।[৬] শুধুমাত্র জানি যে, কাথলিক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাণীপ্রচার কার্যের দ্বিতীয় দফায়, ঋষি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। তৎকালীন মধ্য বঙ্গীয় মিশনে ইতালীর একটি নব্য প্রতিষ্ঠিত মিশনারী ধর্মসম্প্রদায়, যা পরবর্তীতে পিমে নাম ধারণ করে, তার পথিকৃৎ ও অগ্রদূত হিসেবে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফা: মারিয়েত্তির আগমন ঘটেছিল। পিমে ফাদারগণ অনতিবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন ধর্মে মুসলমান ও হিন্দুরা আগ্রহী নয়। তাই তারা যশোর ও শিমুলিয়ার আশপাশ অঞ্চলের ঋষি সম্প্রদায়ের প্রতি এবং খুলনা ও সুন্দরবন অঞ্চলের নমশূদ্রদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন। ঋষিরা এক সময় ছিল, এবং এখনো, একেবারে নিম্ন জাতি বা বর্ণের মানুষ, যাদেরকে সবাই তাদের ঐতিহ্যবাহী চামড়ার পেশার কারণে ঘৃণা করে, আর এই কারণে তারা অস্পৃশ্যতার নামে ঘৃণিত। পিমে ফাদারগণ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন, যে বছরে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মিশনের দায়িত্বভার ঋষি সম্প্রদায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে উত্তর বঙ্গের দিকে অগ্রসর হওয়ার, যেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠী আপাতদৃষ্টিতে বাণীপ্রচার কার্যের নতুন ও অনেক বেশী সুবিধাজনক ক্ষেত্র হওয়ার হাতছানি দিচ্ছিল। ফাদার কস্তা, যিনি সর্বশেষ পিমে ফাদার হিসেবে শিমুলিয়া মিশন ত্যাগ করেন, তিনি তার এক পত্রে হতাশাবোধ এবং পিমে ঋষি মিশনের ব্যর্থতা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন : “আমার মনোবল পুনরুদ্ধারে কিছু দিনের জন্য স্বদেশে ফিরে যাওয়া আমার জন্য প্রয়োজন; আমার এ সকল খ্রীষ্টানদের মধ্যে থাকাকালীন বছরগুলিতে আমি অভিজ্ঞতা করেছি অনেক বেশী মোহমুক্তি। আমি সত্যিই ক্লান্ত।”[৭] ঋষিদের মাঝে পিমে মিশন মোহমুক্তি ও অতৃপ্তি দ্বারা চিহ্নিত। মিশনারীগণ প্রায়শ এমন অভিযোগ করতেন যে, ঋষিরা “এত বেশী ভণ্ড, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ যে, তাদের পক্ষে বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে কাথলিক ধর্ম গ্রহণ সম্ভব নয়”।[৮] তারা অনেক সময় দুঃখ ক'রে বলতেন, ঋষিরা শুধুমাত্র “অর্থের জন্য”[৯] খ্রীষ্টান হতে প্রস্তুত। এদের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল অবিশ্বস্ততা, কেননা তারা প্রস্তুত ছিল এক টুকরো রুটির জন্য খ্রীষ্টান হতে এবং তাদেরকে যখন আর রুটি দেওয়া হয় না তখন আবার হিন্দুধর্মে ফিরে যেতে। সালেসীয় ফাদারগণ যশোর ও শিমুলিয়া অঞ্চলে ঋষি মিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তা ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তা চালিয়ে নিয়েছিলেন। তবে তাদের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা মিশনটির ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। পিমে ফাদারগণ যেখান থেকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সালেসীয় ফাদারগণ সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন। তারা বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর। ঋষিদের সঙ্গে তাদের মেলামেশায় তারা সম্ভবত জোর দিতেন আধ্যাত্মিক দিকের উপর, তবে এটা আস্থা অর্জনে ঋষিদের সাহায্য করতে পারেনি। স্পষ্টতই, ঋষিরা একমাত্র তখনই খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সাড়া দিত যখন মণ্ডলীও সাহায্য ও মানব মর্যাদার জন্য তাদের অনুরোধে সাড়া দিত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শিমুলিয়া মিশনে পালকীয় সফর উপলক্ষ্যে ধর্মপ্রদেশ পরিচালক মনসিনিয়র স্কুদেরীর বলা কথাগুলো অনেক জোরালো : “আমি মনে করি জনগণের সামাজিক ও নাগরিক জীবন বিষয়ে আমাদের অনেক বেশী আগ্রহী হওয়া উচিত। ধর্মের বাইরে বিষয়সমূহ নিয়ে ধর্মাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব রয়েছে। যদি ভুল না করি, তাহলে তাদের ব্যাপারে, তাদের কষ্ট-অসুবিধা, ঝগড়া-বিবাদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের আগ্রহী হওয়াটা আমি প্রয়োজন মনে করি।”[১০] অবশেষে সালেসীয় ফাদারগণকে তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন ইতালীর অপর নব্য প্রতিষ্ঠিত মিশনারী সংঘ জেভেরিয়ান ফাদারগণ।

যে সময়টা পিমে ও সালেসীয় মিশনারী ধর্মসম্প্রদায়গুলো কাজ করে যাচ্ছিল, সেই একই সময়ে জেসুইটগণ সাতক্ষীরা ও বড়দলের ঋষিদের নিয়ে তাদের ভাগ্যের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলেন। মাণ্ডলিক আইন অনুসারে এ জায়গাগুলো কলকাতা কাথলিক ধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যখন আইনগত দিক থেকে যশোর ও শিমুলিয়া ছিল কৃষ্ণনগর ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত। জেসুইট মিশনকে নানা রকম কষ্ট-অসুবিধার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে হয়েছিল। প্রথমে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, আর বিশেষ করে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, এ মিশনের পতন ঘটে, এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে

পুনরায় এটা নবরূপে যাত্রা শুরু করে। ঋষিদের মাঝে জেসুইটগণের ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতার (১৯১৮-১৯৫২) বিস্তারিত গভীরে না গিয়ে, এখানে আমি মাত্র ঋষি সম্প্রদায় ও জেসুইট ফাদারগণের মধ্যে সম্পর্ক সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিশনটি দুর্বল ছিল। শুরু থেকেই এটা মিশনারী কর্মীর দারুণ অভাবে পড়ে। সাতক্ষীরা-বড়দলের মত বিশাল অঞ্চলে বড়জোর দু'জন জেসুইট ফাদারের দেখা মিলত। তবে, অধিকাংশ সময়, এখানে শুধুমাত্র একজন মিশনারী বা প্রেরণকর্মী থাকতেন। তাছাড়া, প্রেরণক্ষেত্রে প্রেরণকর্মীর আগ্রহ-উদ্দীপনাকে কলকাতাস্থ মাণ্ডলিক কর্তৃপক্ষগণ উৎসাহ যোগাতেন না, কেননা ঋষিদের মাঝে প্রেরণকাজের সফলতার সম্ভাবনার ব্যাপারে তারা বেশ সন্দিহান ছিলেন।[১১] জেসুইট মিশনের ব্যবস্থাপনাও ছিল দুর্বল। প্রথম দফায় (১৯১৮-১৯৩০), জেসুইট ফাদারগণ এমন একটি নতুন মিশনে কাজ করে যাচ্ছিলেন, যা কলকাতা থেকে একবার এদিক, একবার ওদিক সরে যাচ্ছিল। শুধুমাত্র দ্বিতীয় দফায় (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে...) সাতক্ষীরায় স্থায়ী জেসুইট উপস্থিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থায়ী উপস্থিতি অবশ্যই দ্বিতীয় মিশনের ইতিবাচক অস্তিত্বে প্রভূত অবদান রাখবে। জেসুইট মিশনারী কর্মকাণ্ড-পদ্ধতি যুগের ঐশতত্ত্ব এবং জনগণের বাস্তব পরিস্থিতিকে প্রতিফলিত করে। সাধারণত যে ঋষি পল্লীগুলো খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করত সে সব পল্লীতেই জেসুইটগণের যাতায়ত ছিল। তবে, এ সকল ইচ্ছার সঙ্গে সব সময় জড়িত থাকত কিছু না কিছু সমস্যা, যেগুলো মিশনারীদের সহায়তায় ঋষিরা বিহিত করতে চাইত। এক্ষেত্রে, বড়দলের দৃষ্টান্ত প্রথমে আসে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, বড়দলের ঋষি সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি কলকাতায় জেসুইটদের সঙ্গে দেখা করে তাদের জানান যে, সমগ্র পল্লী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে আগ্রহী। বড়দলের ঋষিরা ছিল স্থানীয় জমিদার ও পুলিশের নিপীড়নের শিকার। তাদের মধ্যে প্রায় দশ জনকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল আর অবশিষ্টরা ভয়ে দিন কাটাচ্ছিল। জেসুইটদের ইতিবাচক সাড়াদান সাতক্ষীরা মিশনের দ্বিতীয় পথ চলার ইঙ্গিত।[১২] আরও অনেক অঞ্চলে কর্মরত অন্যান্য মিশনারীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, জেসুইটগণ, সম্ভবত, ধর্মীয় বিষয়াদিতে ঋষিদের সুস্পষ্ট অনাগ্রহ লক্ষ্য করা সত্ত্বেও পিছু হটেননি।[১৩] তারা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সকল ঋষিরা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা চায়, তাই তারা তাদের সাধ্যমত এগুলোর নিশ্চয়তাবিধানে প্রস্তুত ছিলেন।[১৪] এমন কাজ অবশ্যই তাদের গৃহীত নতুন ধর্মের প্রতি অবিশ্বস্ততা প্রদর্শনে ঋষি পল্লীগুলোকে বাধা দেয়নি। সাতক্ষীরা মিশনের ডায়েরীগুলো এ ধরনের দৃষ্টান্তে ঠাসা। এ অবিশ্বস্ততার কখনো কখনো কারণ ছিল অবৈধ বিবাহ, আবার কখনো কখনো ফাদারগণ স্কুল প্রতিষ্ঠা বা পুকুর খননে অস্বীকৃতি জানাতেন বলে, অথবা, আইন-আদালতে একজন অপরাধীকে রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানানোর ঘটনা আগে খ্রীষ্টধর্মভুক্ত কোন গ্রামকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মিশনারী মনোভাবেও পরিবর্তন ঘটে যায়। যে সকল ঋষি পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যেত তাদের পরিত্যাগ করা হত এবং প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করা হত।[১৫] কখনো কখনো ভয়ভীতি দেখানো হত স্বধর্মত্যাগকে নিরুৎসাহিত করার জন্য আর গৃহীত খ্রীষ্টধর্মে অটল থাকার নিশ্চয়তাস্বরূপ অর্থ-জামিন চাওয়া হত।[১৬] ফাদারদের মনোভাবে সম্ভবত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল মিশনের দ্বিতীয় দফা থেকে (১৯৩৭)। ফাদার কস্তার ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিখেছেন : "পদ্ধতিটি হল, কাটেখিষ্ট নিয়োগদান, এমনকি সবাই ছেড়ে চলে গেলেও দায়িত্বে অটল থাকা !"[১৭] এ কথাগুলোর নেপথ্যে এ বার্তা ছিল যে, আশাশুনির খ্রীষ্টানরা মণ্ডলী ত্যাগ করেছিল।

জেভেরিয়ান নামে ইতালীর একটি নবীন মিশনারী সম্প্রদায় জেসুইট ও সালেসীয় উভয় ফাদারগণকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে দায়মুক্তি দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের প্রত্যাবর্তন এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তানের বিভক্তি রাজনৈতিক মানচিত্র পুনঃঅঙ্কনের দিকে চালিত হয়েছিল। এর ফলে কৃষ্ণনগর কাথলিক ধর্মপ্রদেশের কিছু অঞ্চল (শিমুলিয়া ও যশোর অঞ্চলসমূহ) নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে চলে আসে। একই ঘটনা কলকাতা কাথলিক ধর্মপ্রদেশের পূর্ব দিকে অবস্থিত অধিকাংশ ধর্মাঞ্চলের ক্ষেত্রেও ঘটে (সাতক্ষীরা ও বড়দল অঞ্চলসমূহ)। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারী পোপ দ্বাদশ পিউস নতুন যশোর ধর্মপ্রদেশ গঠন

করেন যা উপরিল্লিখত অঞ্চলগুলো নিয়ে গঠিত। জেসুইট, সালেসীয় ও অন্যান্য মিশনারী ধর্মসম্প্রদায় নবগঠিত কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালে, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারী যশোর ধর্মপ্রদেশের প্রথম ধর্মপ্রদেশ পরিচালক হিসেবে জেভেরিয়ান বিশপ দান্তে বাত্তেলিয়েরিনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই তখন থেকে জেভেরিয়ান মিশনারীগণ, পরবর্তীতে এ ধর্মপ্রদেশ খুলনা কাথলিক ধর্মপ্রদেশে রূপান্তরিত হওয়ার পর (১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে), এখানে কাজ করে যাচ্ছেন। শুরুটা কষ্টসাধ্য হলেও, জেভেরিয়ানগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব গভীর আগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের পূর্বসুরীদের মত, তারা তাড়াতাড়িই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাত্র ঋষি সম্প্রদায় মঙ্গলবাণী ঘোষণায় আগ্রহী, বর্ণাশ্রমী হিন্দু ও মুসলমানরা তেমন নয়। একই সময়ে তারা ঋষি সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করার সঙ্গে জড়িত নানা কষ্ট-অসুবিধাও বুঝেছিলেন। বড়দল, সাতক্ষীরা ও শিমুলিয়ায় কর্মরত ফাদারগণ তাদের ভক্তজনগণের মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহের অভাব দেখে প্রায়শ দুঃখ প্রকাশ করতেন, পাশাপাশি তারা এ ব্যাপারেও গভীর সচেতন ছিলেন যে, ঋষি সম্প্রদায় তাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক অপেক্ষা বৈষয়িক চাহিদার প্রতি তাদের বেশী দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ঐশতত্ত্বের অধিকারী ঐ সকল আদি মিশনারীগণ অনেক সময় নিরুৎসাহিত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হতেন। উদাহরণ হিসেবে, যখন ফাদার বের্নাক্কিকে তার প্রস্থান বিলম্বিত করার কথা বলা হয় যেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার পুনঃপ্রবেশ ভিসা পেতে পারেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে না জানিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : "আমি অবাক হচ্ছি কিভাবে আপনি আমাকে পাকিস্তান স্মরণের কথা বলতেন পারেন... জীবন রক্ষার অধিকার আমারও আছে"[১৮]; সাতক্ষীরায় পাল-পুরোহিত হিসেবে ২-৩ বছর দায়িত্ব পালন করার পর এই ছিল তার মোহমুক্তি ও তিক্ত অভিজ্ঞতা। প্রতিনিয়ত ঝগড়া-ঝাঁটি, বিবাহের ক্ষেত্রে অনিয়মানুবর্তিতা, গ্রামের মাতব্বর ও ফাদারদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সীমাহীন দরিদ্রতা এবং তাদের চাওয়ার মনোভাব এগুলি অল্প অল্প ক'রে এমনকি জেভেরিয়ানদের মধ্যে যারা অনেক সিদ্ধহস্ত তাদেরও দুর্বল করে দিত। এর শীর্ষভাগে ছিল অতি অল্প সময়কালের মধ্যে ফাদারদের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরিত করার অতি সহজ নীতি, ঋষি খ্রীষ্টানরা যারা অন্য যে-কোন কিছু অপেক্ষা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা অনেক বেশী কামনা করত, তাদের সুস্থিতকরণে অবদান রাখতে পারেনি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর সবকিছু পাল্টাতে শুরু করে। প্রেরণকাজের ঐশতাত্ত্বিক ধারণায় পরিবর্তন আসে আর খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরণ একটি সম্ভাব্য ফল হিসেবে রয়ে গেলেও, এটা যে-কোন মিশনারী উদ্যোগের একমাত্র ফল হিসেবে আর বিবেচিত হয় না। জেভেরিয়ানগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের নিজ নিজ জনগণের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা গুরুত্বের সঙ্গে নিতে শুরু করেছিলেন, কেননা তারা বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের কথা শোনানোর আগে প্রতিদিনকার অন্ন যোগাড়ের কথা প্রথমে তাদের শোনানো প্রয়োজন। এখানে শুধু এইটুকুমাত্র বলা যথেষ্ট যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ যাবৎ সর্বাপেক্ষা বড় উদ্যোগ সম্ভবত জেভেরিয়ানগণ শিমুলিয়া মিশনে গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন পাল-পুরোহিত ফাদার মারিও ভেরোনেসি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শিমুলিয়ায় ফাদার ভালেরিয়ানো কব্বের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তারা দু'জনে একত্রে শিমুলিয়ার খ্রীষ্টীয় সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন সমবায়, ক্রেডিট ইউনিয়ন শুরু ক'রে আর সেই সাথে একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জলসেচ প্রকল্প হাতে নিয়ে, যার লক্ষ্য ছিল অত্র অঞ্চলের খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকল ক্ষুদ্র চাষীদের বড় বড় ভূপতিদের লোভ ও শাসন থেকে মুক্ত করা। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দু'জন ফাদারকে কয়েক বছরের মধ্যে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান বাহিনী ফাদার ভেরোনেসিকে হত্যা করে যখন তিনি যশোরে তার খ্রীষ্টানদের রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। এ ঘটনার দু'বছর পর, অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা ফাদার কব্বেকে গুলি করে হত্যা করে, খুব সম্ভবত এটা ছিল, যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা শিমুলিয়ার দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্জন করেছিল, তা যারা সহ্য করতে পারেনি, তাদের ন্যায্য(!) প্রতিদান। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী দু'দশক সাক্ষী হয়েছে জেভেরিয়ানদের মধ্যে অনেক আলোচনার, এই সময় থেকে তারা ঋষিদের নিয়ে এবং তাদের মাঝে উপস্থিত থাকার নানা উপায় নিয়ে চিন্তা-

ভাবনা করতে শুরু করেছেন। জেভেরিয়ানগণ বাংলাদেশে তাদের প্রেরণকাজের একটি বিশেষ সুবিধাজনক লক্ষ্য হিসেবে ঋষি সম্প্রদায়কে বেছে নেন। এই নতুন চিন্তাধারার ফলশ্রুতিতে, উপস্থিতির নতুন নতুন দুয়ার খুলে যায়। সত্তর দশকের শেষের দিক থেকে ফাদার লুইজি পাজ্জি ও পিয়েরলুইজি লুপি শিক্ষার মাধ্যমে ঋষিদের মুক্তি আনয়নের সুস্পষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে চুকনগরে তাদের উপস্থিতি সূচিত করেছেন। তাদের মাঝে উপস্থিতির এই সময়কালে ঋষিদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরণের কথা ভাবা হয় না। তবে এ উপস্থিতি শুধুমাত্র নতুন নতুন কর্মকাণ্ড শুরু করার জন্য নয়, কিন্তু পুরনো যত কর্মকাণ্ডের নবায়ন ঘটানোরও জন্য। ফাদার জার্মানো আন্তনিও, যিনি ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়দলে পাল-পুরোহিত পদে নিযুক্ত হন, তিনি প্রথমে ফাদার কলম্বারার সঙ্গে আর পরে ফাদার তোরেসানির সঙ্গে গরুকে বিষ খাওয়ানো এবং মরা প্রাণীর মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামাজিক কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বাস করা হয় যে, এ সকল ঐতিহ্যগত অভ্যাস পরিত্যাগ না করলে, বড়দলের খ্রীষ্টানরা বিশেষ করে পারিপার্শ্বিক অ-খ্রীষ্টীয় সমাজের সম্মুখে তাদের 'মুচি' নামটি কখনোই ঘোচাতে পারবে না।

শেষ কুড়ি বা তার বেশি বছর প্রত্যক্ষ করেছে খুলনায় কাথলিক মণ্ডলীর ক্রমবিকাশ এবং স্থানীয়দের যাজক পদে অভিষেক, এমনকি ঋষি খ্রীষ্টানদের মধ্য থেকেও। এ ঘটনা তাদের সকলের জন্য এবং আমাদের জেভেরিয়ানদের জন্য সত্যিই গর্বের। স্থানীয় পর্যায়ে যাজকদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি, শেষোক্ত দুই দশক আরও প্রত্যক্ষ করেছে জেভেরিয়ান উপস্থিতির এক ধরনের পুনঃগঠনের। বাস্তবে এর অর্থ হল, ভারপ্রাপ্ত এলাকা থেকে, এবং দুঃখের সঙ্গে, প্রেরণদায়িত্বের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে, কর্মরত জেভেরিয়ানকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। ঋষি মিশন সিদ্ধান্তে জেভেরিয়ান অগ্রাধিকারগুলো শীর্ষে থাকলেও, একে বিগত বছরগুলিতে আগ্রহ ও কর্মীর অভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই মুহূর্তে ফাদার জার্মানোই হচ্ছেন একমাত্র জেভেরিয়ান যিনি ঋষিদের মাঝে কর্মরত। ঋষি সম্প্রদায়ের কারণের জন্য তার আজীবন আত্মনিবেদন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

কাথলিক মণ্ডলী ও ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে জটিল সম্পর্কের ইতিবৃত্তের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি দু'টি পরস্পর গ্রন্থিত কাহিনীর ইতিবৃত্তরূপে পাঠ করা যেতে পারে : অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট প্রথম কাহিনীটি হচ্ছে ঋষি সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণকে ঘিরে, আর অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট দ্বিতীয় কাহিনীটি হচ্ছে, ঋষি সম্প্রদায়ের কারণের জন্য কাথলিক মণ্ডলীর নিজ জীবনের আমূল সংস্কার সাধনকে ঘিরে। এ কথা সত্য যে, প্রশ্নের উত্তরে ঋষি জবাবদাতার অভিপ্রায়ে, উপরোল্লিখিত রূপকের সাপটি হচ্ছে, ঋষি জনগোষ্ঠী আর অপর দিকে ব্যাঙটি হচ্ছে মণ্ডলীর প্রতীক; এ কথাও সত্য যে, রূপকটিকে ঘুরিয়ে অন্যভাবেও পাঠ করা সম্ভব ঃ মণ্ডলী সাপের এবং ঋষি জনগোষ্ঠী ব্যাঙের প্রতীক হতে পারে। ঋষিদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় অভিপ্রায়ের অভাবে মিশনারীগণ প্রায়শ দুঃখ প্রকাশ করতেন। আর মিশনারীদের সম্পর্কে কি বলা যায়, এ কথা কি সত্য নয় যে, ঋষিদের নিয়ে মিশনারীদেরও তেমন কোন গোপন কর্মপরিকল্পনা ছিল না ? কয়েক বছর আগেও মণ্ডলী ঋষিদের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রথমদিকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ –এ উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে রচিত ছিল যে, ঋষি সম্প্রদায় মঙ্গলসমাচারে আগ্রহী। কিন্তু কেউ-ই প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করেনি, কেন এই আগ্রহ। অন্য কোন দল বা সম্প্রদায় মঙ্গলসমাচারে আগ্রহী হলে, মিশনারীগণ হয়ত তাদের মনোযোগকে সেই দিকেই চালিত করতেন। ঋষি সম্প্রদায় সুযোগটির পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছিল। খ্রীষ্টধর্মের নিকট অগ্রসর হয়ে ঋষি সম্প্রদায় যে মানব স্বীকৃতির অন্বেষণ করছিল, তার প্রয়োজনীয়তা মিশনারীগণ হাল আমল পর্যন্ত অনুভব করতে পারেননি। মণ্ডলীর দিক থেকেও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ের অভাব ছিল। বাণীপ্রচারকে ঘিরে সংকীর্ণ ধারণার কারণে, মিশনারীগণ একমাত্র যে বিষয়টির পেছনে ছুটতেন, তা ছিল প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর প্রাতিষ্ঠানিক সমাহার। ঋষিরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন, আর তাই তারা বুদ্ধিমত্তার সাথে সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিল। এই কারণে শুরুগুলো ছিল কঠিন : মিশনারীগণ যে অনন্ত, উর্ধ্ব জাগতিক মুক্তি প্রদান করেছিলেন, তার দ্বারা ঋষি সম্প্রদায়ের জাগতিক মুক্তি সাধনা পূরণ হয়েছিল বা হয়নি।

রূপকটিতে, মণ্ডলীরূপ সাপটি ঋষি সম্প্রদায়রূপী ব্যাঙটিকে ছেড়ে দিতে পারেনি, কেননা দিনের শেষে ব্যাঙই ছিল একমাত্র সম্বল। অপরদিকে, ঋষি সম্প্রদায়রূপী সাপ মণ্ডলীরূপী ব্যাঙকে ছেড়ে দিতে পারেনি, কেননা এই একমাত্র ব্যাঙই তাদের জন্য কিছু করতে পারে। বস্তুত, মণ্ডলীর নিকট আসার তাদের সিদ্ধান্তে ঋষি সম্প্রদায় সঠিক ছিল বলে মনে হয়। প্রথম দিকে, তাদের মানব পরিপূর্ণতার অন্বেষণ ফাদারদের যত্নশীল ও পিতৃসুলভ হাত পূরণ করেছিল। সেই সময় মানব মানোন্নয়নের ছিল ভিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য, ভিক্ষাদান হচ্ছে, যে-কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভাবনার বাইরে একটি ধর্মসম্মত কাজ যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। ফাদারগণ অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করতেন খ্রীষ্টান ঋষিরা একপ্রকার একঘরে অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে। কিন্তু আসলে তারাই পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনেক অবদান রেখেছেন। মাত্র সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, মণ্ডলী ভিন্ন চোখে ঋষিদের দেখতে শুরু করে আর তাদের অন্তর্ভুক্তকরণের চিন্তাভাবনা শুরু করে। এই সময়ে এই বিগত বছরগুলিতেই ফাদারগণ বুঝতে শুরু করেন যে, বাণীপ্রচারই মণ্ডলীর সব নয়। আসলে যে-কোন মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত মনুষ্যত্বের পূর্ণতার বিকাশ ঘটানোই খ্রীষ্টধর্মের কাজ। এ ধর্মের লক্ষ্য একজন আদর্শে ভরপুর মানুষ হিসেবে খ্রীষ্ট। এটা হচ্ছে, যে-কোন ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্তি, যা শুরু হতে হবে এখানে ও এখন থেকেই। এ দিক দিয়ে ঋষিরা ঠিক ছিল। বাণীপ্রচারকে ঘিরে চুকনগরে ফাদার লুইজির অভিজ্ঞতা এ রকম : বিনিময়ে কিছু দাবি না করে মানব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত একটি জাতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া। ঋষি সম্প্রদায়ের মাঝে তার প্রায় ২৫ বছরের জীবনে দয়া বা উপকারই ছিল তার সক্রিয় হাতিয়ার। হ্যাঁ, তার প্রেরণকার্যাধীন মণ্ডলীর জীবনের আমূল পরিবর্তনের পাশাপাশি, পরিবর্তন ঘটে ঋষিদেরও। ঋষিদের মধ্যে পুরনো খ্রীষ্টানরা কিভাবেই না তাদের উৎসমূল লুকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করত –এটা দেখতে বেশ ভাল লাগত। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সময় তাদের অধিকাংশ পূর্বপুরুষ নিজেদের উৎসমূল লুকাতে গিয়ে তাদের পদবী পরিবর্তন করতেন। কিন্তু আজকের ঋষি সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানরা শুধুমাত্র তাদের পদবীই ধরে রাখে না, পাশাপাশি তারা তাদের ঋষি উৎসমূলের কথা ঘোষণা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। অধিকন্তু, ঋষি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দরুণ তারা গর্ববোধ করে। তাদের ইতিহাসে কেন তারা লজ্জা পাবে : তারাই তো শিকার। বরং আমরা যারা শিকারী, আমাদের ইতিহাস নিয়ে আমাদেরই লজ্জা পাওয়া উচিত। তবে কথা হল, আমরা কি লজ্জিত ? যদি ঋষি সম্প্রদায় প্রায়শ এক ধরনের হীনম্মন্যতা অনুভব করে, তাহলে, অপরদিকে, আমরা তাদের সঙ্গে কাজ-কারবারে শ্রেষ্ঠম্মন্যতা অনুভব করি। এ কথা সম্ভবত: কম লোকই জানেন যে, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত ভবরপাড়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত আনন্দবাস গ্রামে দু'টি গীর্জাঘর ছিল : একটি ঋষি সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টানদের জন্য, আর অপরটি অবশিষ্ট খ্রীষ্টানদের জন্য। তিনি হচ্ছেন ফাদার আলবার্তন, যিনি একটি গীর্জা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন আর সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের একই উপাসনা অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জন্য গীর্জা একটা হলেও, অন্তত:পক্ষে ১৯৯৬ খ্রী: পর্যন্ত দু'টি দলের মধ্যে বিভক্তি অনেক স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল। খুলনার অন্যান্য মণ্ডলীগুলোর মধ্যে এ ধরনের ঘটনার কথা আমার জানা নেই। যা জানি তা হচ্ছে, এমনকি আজও অনেক খ্রীষ্টান আছে, যারা ঋষি পটভূমি থেকে আগত সহ-খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশতে খারাপ বোধ করেন। জাতি প্রভেদগুলো মাড়িয়ে বিবাহের ঘটনা এত বিরল যে, তা বিস্তৃত কাথলিক সমাজে খ্রীষ্টান ঋষিদের পূর্ণ অন্তর্ভুক্তকরণ সম্পর্কে বলার সুযোগ আমাদের দেয় না। আর পরিশেষের হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, খুলনা মণ্ডলী এর ভূমণ্ডলে ঋষিদের হেতুর প্রতি খুব বেশী আগ্রহ দেখায় না বলে বোধ হয়। অনেক সময় শুধুমাত্র মণ্ডলীর বৈদেশিক নীতি ঋষি সংক্রান্ত বিষয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। অবশ্যই, ঋষি সম্প্রদায়ের এখনো মন-পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে একইভাবে এর সকল অংশে মণ্ডলীরও আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

ঋষি সম্প্রদায় ও মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক এখনো পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। সাপ ও ব্যাঙের মধ্যকার জটিল সংলাপটি প্রতিনিয়ত ক্রমবিকাশের মধ্যে রয়েছে। এখনো অনেক সমস্যা রয়ে গিয়েছে। তবে এ কথা স্বীকার করা

গুরুত্বপূর্ণ যে, ঋষিরাও ঈশ্বরের জনগণ আর ঐশ আহ্বানের প্রতি তাদের সাড়াদান ভিন্ন ভিন্ন মুখায়ব ধারণ করতে পারে, এটা যে অনিবার্যভাবে মণ্ডলীর মুখায়ব হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। মণ্ডলীকে অবশ্যই এর নিজ অধিকার বলয়ের মধ্যে, ঋষি সম্প্রদায়ের পরিত্রাণের একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে হবে, এ পরিত্রাণ প্রথম: জাগতিক, পরে ঊর্ধ্ব জাগতিক। কষ্টভোগী মানবতার এর সেবায়, মণ্ডলী প্রতিনিয়ত ঋষি জনগণকে ঈশ্বরের উদারতাপূর্ণ ভালবাসার কথা শুনিয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতা : Sergio Targa

---

(১) এখানে প্রকাশিত মতামত লেখকের একান্ত নিজস্ব। এ জন্য লেখক ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়।

(২) দ্র:Sureshchandra Banerjee tr., Monusonghita, Calcutta : Anando Publishers, 2000, 10 oddhae, 4 sloka, p. 286 (in Bengali).

(৩) দ্র:Sureshchandra Banerjee tr., Monusonghita, Calcutta : Anando Publishers, 2000, 10 oddhae, 51-55 sloka, pp. 291-292 (in Bengali).

(৪) উদাহরণস্বরূপ আমার ময়মনসিংহ জেলায় ঋষি কথা বা নাম পরিচিত নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের রুবিদাস নামে ডাকে। তবে তৎসত্ত্বেও আশেপাশের হিন্দু-মুসলিম তাদের সকলকে মুচি বলেই জানে।

(৫) Zene C., The Rishi of Bangladesh, London : RoutledgeCurzon, 2002, p. XV.

(৬) যেরোম ডি'কস্তা, বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী, ঢাকা : প্রতিবেশী প্রকাশনী ১৯৮৮, পৃ: ১৬। এখানে বলা হয়েছে অনেক নিম্নবর্ণের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু এ সকল লোক কারা এবং তাদের জাতি বা বর্ণ পরিচয় কি সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

(৭) Quoted in Zene C., The Rishi of Bangladesh, London : RoutledgeCurzon, 2002, p. XV 122.

(৮) Fr. Marietti in Zene C., op. cit., p. 110.

(৯) দ্র: ঐ, পৃষ্ঠা ১১০

(১০) দ্র: ঐ, পৃষ্ঠা ১২৮

(১১) ফাদার ওয়ান্টার্স তার কর্তৃপক্ষের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন প্রেরণক্ষেত্রে একজনকে পাঠানোর জন্য। মুচিদের নিয়ে মনসিনিয়রের ছিল ভ্রান্ত ধারণা। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঋষি মিশনের পতন ঘটলে, ফাদার ওয়ান্টার্স মিশন কর্তৃপক্ষ এর. M. Veys এর নিকট গিয়েছিলেন এ 'শুভ বার্তা' ঘোষণা করার জন্য যে, মুচি মিশনের পতন ঘটেছে; তখন এর. M. Veys তাকে প্রশ্ন করেছিলেন : "কেন আপনি একে শুভ বার্তা বলছেন ?" প্রত্যুত্তরে ফাদার ওয়ান্টার্স বলেছিলেন : "আপনি জেনে খুশি হবেন যে, সেখানে আর কাউকে প্রয়োজন নেই।" In Germano A. ed., Satkhira Mission : The Starting of the Mission in the Diaries of the Jesuit Fathers. Vol II : 1925-1939. Khulna, 1998. Unpublished manuscript, p. 2.

(১২) দ্র: Germano A. ed., Satkhira Mission ...Vol II, p. 2.

(১৩) ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফাদার কস্তার লিখেছেন : "এদের ধর্মীয় মন-মানসিকতাসম্পন্ন করে তুলতে বহু বছর লেগে যাবে।" In Germano A. ed., Satkhira Mission : The Starting of the Mission in the Diaries of the Jesuit Fathers. Vol III : 1939-1943. Khulna, 1998. Unpublished manuscript, p. 2.

(১৪) ফাদার দেমান ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লিখেছেন : "যেখান থেকে সাহায্য ও নিরাপত্তা আসবে, সেখানেই তারা ছুটে যাবে।" In Germano A. ed., Satkhira Mission ...Vol II, p. 14.

(১৫) ফাদার দেসা জুন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন : "যারা আমাদের মিশন ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের অনেকে ওষুধের জন্য আসে, তবে আমি তাদের সাফ না জানিয়ে দিই।" In Germano A. ed., Satkhira Mission ...Vol I, p. 23.

(১৬) দ্র: Germano A. ed., Satkhira Mission ...Vol I, pp. 20-21;27-27.

(১৭) In Germano A. ed., Satkhira Mission ...Vol III, p. 42.

(১৮) Zene C., op. cit., p. 239.